ব্রেক্সিট, ট্রাম্প, ও বিশ্বায়নের রথের চাকা – এবার ফিরাও মোরে ?

মৈত্রীশ ঘটক

১

বার্লিন প্রাচীরের পতনকে যেমন সমাজতন্ত্রের পতনের প্রতীক ধরা হয়, ঠিক সেভাবেই ব্রিটেনে গণনির্বাচনের মাধ্যমে য়ুরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে আসার পক্ষে সিদ্ধান্তকে (যাকে ব্রেক্সিট, অর্থাৎ, ব্রিটেন + এক্সিট বলা হচ্ছে), আমরা দেখতে পারি বিশ্বায়নের জয়রথ থমকে দেওয়া এক ভূকম্পের প্রতীক হিসেবে।

সঙ্কীর্ণ অর্থনৈতিক ব্যাখ্যানে বিশ্বায়ন হল বহির্মুখী বাণিজ্যনীতি এবং পুঁজির অবাধ গতিময়তা। এর এক কথায় অর্থ হোল, বাজারের সীমার বিস্তার ⍰ একদিকে ক্রেতাদের জন্যে পণ্য-পরিষেবার ভাণ্ডারের জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রসার, যেমন, আই-ফোন থেকে কেএফসি। আর অন্যদিকে, পুঁজিপতিদের জন্যে উৎপাদনের যে নানা উপাদান (শ্রম, দক্ষতা, প্রাকৃতিক সম্পদ), তার আন্তর্জাতিকীকরণ। যেমন, কোন কোন ক্ষেত্রে তা অনুন্নত দেশের শস্তায় শ্রমের সুযোগ নেওয়া (যাকে আউটসোর্সিং বলা হয়) আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তা কম মজুরীতে দক্ষ শ্রম যোগানের সুবিধার্থে অভিবাসনের সুযোগ করে দেওয়ার রূপ নেয়।

বৃহত্তর অর্থে বিশ্বায়ন হল সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের ঊর্ধে উঠে বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি এমন বিশ্বনাগরিকত্বের নীল আকাশে ডানা মেলা। তার

মধ্যে ধর্ম-জাতি-সংস্কৃতি নিয়ে বিবিধের মাঝে মিলনের উৎসব আছে। আর আছে কোনো দেশই বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়, অন্যদের সমস্যা আমারও সমস্যা ধরণের বহির্মুখী আন্তর্জাতিকতা। টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটের কল্যাণে আমাদের বসবার ঘরে বিবেকের দরজায় রাতের কড়ানাড়ার আওয়াজ বাড়তে থাকে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে। এর অনেক ভাল দিক আছে। যেমন, মানবাধিকার বা দারিদ্র বা পরিবেশ-রক্ষা নিয়ে সারা বিশ্বজুড়ে অন্তত শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে একধরণের ঐকমত্য তৈরি হয়েছে, যা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে শাসকদের ওপর খানিকটা হলেও চাপ সৃষ্টি করে।

অথচ, আজ পাশ্চাত্যের পৃথিবীতে একবার চোখ বুলোলেই বোঝা যাবে, ক্ষুদ্র বা বৃহত্তর অর্থে বিশ্বায়নের স্বপ্ন আপাতত ধুলোয় লুটোচ্ছে। বিশ্বায়ন, অভিবাসন, এবং অর্থনৈতিক উদারবাদের বিরুদ্ধে পুঞ্জিভূত গণরোষ ঝোড়ো হাওয়ার মত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কায়েমি ব্যবস্থার ভিত কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

ব্রিটেনের ব্রেক্সিট নির্বাচন থেকে আমেরিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের উত্থান, অস্ট্রিয়ায় সাম্প্রতিক নির্বাচনে চরম-দক্ষিণপন্থী ফ্রিডম পার্টির অতি অল্প ব্যবধানে হার, জার্মানিতে অল্টার্নেটিভ ফর ডয়েশল্যান্ড এবং ফ্রান্সে ল পেনের ন্যাশনাল ফ্রন্টের নির্বাচনী রমরমা, হাঙ্গেরি থেকে টার্কিতে অসহিষ্ণু সংখ্যাগুরুবাদের (majoritarianism) উত্থান একটা দিকেই নির্দেশ করে – আটলান্টিকের দুই তীরেই বিজাতবিদ্বেষ (xenophobia) আর বিচ্ছিন্নতাবাদের (isolationism) একটা ঝড় ঘনিয়ে উঠছে।

বিজাতবিদ্বেষের অনেক চেহারা আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত হোল অভিবাসীদের প্রতি বিক্ষোভ । অভিবাসন হোল বিশ্বায়নের রক্ত-মাংসের অবয়ব। "চিনেরা আমাদের চাকরি নিয়ে নিচ্ছে" বা "ব্যাঙ্কে ফোন করলে ঐ ভারতীয়গুলো অদ্ভুত উচ্চারণে কথা বলে" এই সব খুচরো বিজাতবিদ্বেষী চিন্তা তীব্র রূপ পায় যখন তারা অভিবাসী হিসেবে দৃশ্যমান হয় ঘরের দোরগোড়ায় । অভিবাসীদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের কিছু অভিব্যক্তি চেনা লাগবে, কারণ স্থান-কাল-গোষ্ঠী ভেদে একই কথা শোনা যায় । যেমন - "ওরা"-ই হল সব নষ্টের মূল - আমাদের চাকরি নিয়ে নিচ্ছে, একদিকে স্কুল আর হাসপাতালে ভিড় আর অন্যদিকে অপরাধীদের সংখ্যা বাড়াচ্ছে? বাসে-ট্রেনে ঐ অদ্ভুত পোশাক আর বিজাতীয় ভাষায় কথা বলা শুনলে মনে হয়, আমার পরিচিত দেশটা গেল কোথায়? ক্রমাগত ওদের ভিড়ে আমাদের ধর্ম-সংস্কৃতি-জীবনযাত্রা কলুষিত হচ্ছে - কোনদিন দেখবেন ওরাই দেশটা চালাচ্ছে।

পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে বিচ্ছিন্নতাবাদের মূল কথা হল, আমাদের আমাদের মত থাকতে দাও। ওইসব বিশ্বপ্রেম আর বসুধৈব কুটুম্বকম অনেক হয়েছে। বিদেশী জিনিস এবং প্রতিবেশী কোনটাই আমরা চাইনা (যেমন, বি আমেরিকান বাই আমেরিকান) । আর অবশ্যই চাইনা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর বিদেশনীতি, যেখানে আমাদের গরীব ঘরের ছেলেরা মরবে বিশ্বশান্তি বজায় রাখতে বা মধ্যপ্রাচ্যে কোন পেটোয়া একনায়কের গদি বাঁচাতে।

অভিবাসন, বেকারত্ব, আয়ের পথে ভাঁটা এবং সব মিলিয়ে বাইরের কোনও শক্তি – সে ব্রাসেলসের আমলারাই হোক, কি বহুজাতিক সংস্থাগুলো, আইএমএফের মত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, বিশ্বায়িত পুঁজি, কিংবা ডব্লিউটিও গোছের আন্তর্জাতিক চুক্তি – এদের অঙ্গুলিহেলনে পুরোনো জীবনযাত্রা আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হারিয়ে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে নিজের দেশে নিজের নিয়মে থাকার অধিকার। এমন একটা নিরাপত্তাহীনতার বোধ থেকে তীব্র ভয়ের জন্ম হচ্ছে। তার সঙ্গে জুড়ে দিন সন্ত্রাসবাদের আতংক যা অভিবাসীদের প্রতি নাগরিকদের বড় একটা অংশের বিতৃষ্ণা বিদ্বেষ ও ঘৃণায় পরিণত করেছে ? তাদের ভাব আগেই ছিল, কোথায় দেবে আর নেবে, এরা তো শুধুই নেবে আর নেবে! আর এখন হয়েছে, কোথায় মেলাবে-মিলিবে, এ যেন, মারিবে-মরিবে যাবেনা ফিরে!

তাহলে আর বুঝতে অসুবিধে হবে না, ট্রাম্পের মেক্সিকোর সীমানায় পাঁচিল তৈরির স্লোগান বা মুসলিমদের দেশে ঢুকতে দেওয়া হবেনা বা চিনের সাথে কড়া হতে হবে এই সব হুমকি কেন এত জনপ্রিয় হয়েছে। ভাবনাটা খানিকটা – আমাদের দোরগোড়ায় বর্বরদের ভীড়, আমাদের সীমানার ভেতরেই ঘাঁটি গেড়েছে শত্রু, আমাদের চিরাচরিত জীবনযাত্রা ধ্বংস হওয়ার মুখে, আর আমরা যখন সমস্যায় আছি আমাদের রাজনীতিকরা হয় নির্বিকার, আর নয়তো ঐ বহিরাগত শক্তিগুলোর হয়েই সক্রিয় ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কোন প্রক্রিয়ায় এই রাজনৈতিক গণরোষের মেঘ জমতে জমতে কালবৈশাখী ঝড়ের মত পশ্চিমের গণতন্ত্রের ভিত কাঁপিয়ে দিল ? সেই বিক্ষোভ বামপন্থী না হয়ে দক্ষিণপন্থী আন্দোলনের রূপ নিলো কেন? পরের অংশে এই দুটি

আলাদা কিন্তু পরস্পর-সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজবো। আর, প্রবন্ধের শেষ অংশে আলোচনা করব কোন পথে প্রগতিশীল সামাজিক নীতি এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতির সাথে বিশ্বায়নের সামঞ্জস্য রাখা সম্ভব।

২

অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, অসন্তোষের যে ঢেউ আটলান্টিকের দুই কূলে আছড়ে পড়ছে, তার মূল কারণকে তিনটে শব্দে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে – বাণিজ্য, পুঁজির চলনশীলতা এবং অভিবাসন। তার সাথে যুক্ত ২০০৮এর আর্থিক সঙ্কট যার বিষক্রিয়া শুরু হয় আমেরিকার ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে এবং তারপর ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বায়িত অর্থনীতির শিরা-উপশিরা দিয়ে সারা পৃথিবীতে, যার পরিণাম মন্দা এবং বেকারি।

সাম্প্রতিক নির্বাচনী ফলের বিদ্যুৎচমকে পশ্চিমের রাজনৈতিক মানচিত্রে যে ফাটল সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তার উপসর্গগুলো কিন্তু অর্থনৈতিক গবেষণার আতসকাঁচে বেশ কিছুদিন ধরে ক্রমশ দৃশ্যমান হচ্ছিল। যেমন দীর্ঘ দিন ধরে আয় ও ধনের ক্রমবর্ধমান অসাম্য চোখে পড়ছিল, যার গতিবিধি ফরাসি অর্থনীতিবিদ টমাস পিকেটি সযত্নে নথিবদ্ধ করেছেন। আর তার সঙ্গে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমি দেশগুলিতে শিল্প ক্ষেত্রে মজুরি ও কর্মসংস্থানে ভাটা পড়া যার কারণ বিশ্বায়নের ফলে শ্রমের সন্ধানে স্বল্প-মজুরির দেশে পুঁজির যাত্রা, আর প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে কিছু ধরণের শ্রম-নির্ভর কাজের যান্ত্রিকীকরণ। একই সাথে আর্থিক বৃদ্ধির রেলগাড়ির চাকা মন্থর হতে হতে প্রায় স্থির হয়ে গেছে, তাই মজুরি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সম্ভাবনাও ক্ষীণ থেকে

ক্ষীণতর হচ্ছে । পাশ্চাত্যের অর্থনীতির আকাশে এই সব উপাদানগুলো কালচে মেঘের মত দীর্ঘদিন নিঃশব্দে জমছিল।

মজার কথা হল, অর্থনীতিবিদরা বরাবর পণ্য-পরিষেবা, শ্রম-পুঁজি, দক্ষতা ও উদ্ভাবনী ভাবনার মুক্ত ও বাধাহীন চলাচলের গুণ গেয়ে এসেছেন। তাঁদের মতে পণ্য-পরিষেবা, শ্রম-পুঁজি, দক্ষতা ও উদ্ভাবনী ভাবনার চলাচল মুক্ত, বাধাহীন হলেই সবার ঘরে সমৃদ্ধি আসা সম্ভব। এর মূল যুক্তি হল অতি সরল বাজারের বা বিনিময়ের যুক্তি । আমরা যেমন আমাদের প্রয়োজনের সব জিনিস নিজেরা নিজের হাতে বানাইনা, আমাদের আপেক্ষিক দক্ষতা নির্ণয় করে, আমরা কোন পণ্য বা পরিষেবা বিক্রয় করব, আর কোনটা কিনব, সেরকম বাণিজ্যের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ তাদের দক্ষতা অনুযায়ী উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নিলে সার্বিক দক্ষতা বাড়বে।

একই কাজ যদি আমেরিকার শ্রমিকের তুলনায় অনেক কম খরচে এবং একই মানে ভারতীয় বা চিনে শ্রমিক করতে পারে, কি যুক্তি আছে সেই কাজ গুলো রপ্তানি না করে দেবার? এতে শুধু অর্থনৈতিক দক্ষতাই বাড়বেনা, অনুন্নত দেশের শ্রমিকদের মজুরি ও জীবনযাত্রার মান বাড়বে। আর আমি যখন মুদির দোকানে বা বাজারে যাব, কি যুক্তি আছে শস্তার বা উন্নত মানের পণ্য আমার করায়ত্ত করতে বাধা দেবার? তা স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত না হোক আর না হোক তো ক্রেতা হিসেবে আমার কি ? যুক্তিটা শুনতে অকাট্য, কিন্তু তাহলে সমস্যা কোথায়? গত এক দশকে বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের কারণ কি?

সমস্যাটা অসাম্যের। বাণিজ্যের বিস্তারের সাথে যেমন সার্বিক দক্ষতা যেমন বাড়ে, তার সুফল সমানভাবে বন্টিত হয়না। একই মানের জিনিস আপনার পরিচিত বিক্রেতার থেকে নতুন কোন দোকানে কম দামে যদি পান, আপনি ক্রেতা হিসেবে লাভবান হবেন। বিক্রেতারও লাভ হবে। সমস্যা হবে আগের বিক্রেতার ব্যবসা ওঠার উপক্রম হবে। একই জিনিস কম দামে দেওয়া গেলে উদ্বৃত্ত বেশি হয় তাই সার্বিক দক্ষতা বাড়বে। কিন্তু আগের বিক্রেতার ক্ষতি কে মেটাবে? বাজারের নির্মম যুক্তি হোল তার দক্ষতা বাড়ানো উচিৎ নয়তো অন্য জিনিস বেচা উচিৎ। রাজনীতির যুক্তি হোল, আমার যেহেতু ভোট আছে, আমাকে কোন ক্ষতিপূরণ না দিলে, আমি এই বাণিজ্য হতে দেবনা। এই হল বাজার-অর্থনীতির আর গণতন্ত্রের একটা মূল দ্বন্দ্ব।

অর্থনীতিবিদ মাত্রেই এই সমস্যাটার সাথে বহুল-পরিচিত – বাণিজ্য এবং শ্রম ও পুঁজির বাধাহীন চলাচল অবধারিত ভাবে দুটো দল তৈরি করে, জয়ী ও পরাজিত। জয়ীদের লাভের পরিমাণ পরাজিতদের ক্ষতির পরিমাণের থেকে বেশি হয়, কারণ সার্বিক দক্ষতা বাড়ে। কিন্তু সরকার এই অসাম্য নিয়ে কিছু না করে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে যাঁরা ক্ষতিগ্রস্থ তাঁরা মুক্তবাণিজ্যের বিপক্ষে ভোট দেবেন।

যদিও চিন ও ভারতে কাজ আউটসোর্সড হওয়ার ফলে গত কয়েক দশকে দুনিয়া জুড়ে দারিদ্র্য কমে এসেছে অনেকটাই। কিন্তু এই একই কারণে পশ্চিমি দুনিয়ার বড় কিছু অংশে অবশিল্পায়ন এবং দারিদ্র্য তৈরি হয়েছে। যারা গত ২৩ জুন প্রবল ভাবে ব্রেক্সিটের পক্ষে ভোট দিয়েছে, আর দলে দলে এসে ট্রাম্পের জনসভা ভরাচ্ছে, তাদের একটা বড় অংশ এই শ্রেণীর মানুষ।

ব্রেক্সিট গণভোটে ‘রিমেইন’ অর্থাৎ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে থেকে যাওয়ার পক্ষে সমর্থন এসেছে মূলত শিক্ষিত এবং উচ্চ-আয়সম্পন্ন নাগরিকদের থেকে। অন্য দিকে ‘লিভ’ বা বেরিয়ে যাওয়ার পক্ষে ছিলেন মূলত বয়স্ক, তুলনায় কম শিক্ষিত, এবং চাকরির নিরাপত্তাহীন স্বল্প মজুরি শ্রমিকরা, অদক্ষ অভিবাসী শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়ার ফলে যাঁদের মজুরি দিনকে দিন আরও কমে যাচ্ছে। বাণিজ্য এবং অভিবাসনের যে সুবিধা তরুণ চাকুরিজীবী শ্রেণী উপভোগ করে, তা এঁরা পান না। আর তাছাড়া ওয়েলফেয়ার বা রাষ্ট্র-প্রদেয় সুবিধার উপর এঁরা তুলনায় অনেকটাই বেশি নির্ভরশীল, আর সেই কারণেই এঁদের ভয়, অভিবাসীরা অন্যায়ভাবে এই সুবিধাগুলোয় ভাগ বসাবে।

এমনকি আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ-চাকুরিজীবী ট্রাম্প সমর্থকদের মধ্যেও ট্রাম্পকে সমর্থনের মূল কারণ কিন্তু চাকরির বাজার আর অর্থনীতি, তাঁরা আশা করেন ট্রাম্পের একবগগা মারকুটে অবস্থান আমেরিকাকে আরও লাভজনক বাণিজ্য চুক্তি আদায় করতে সাহায্য করবে, পাশাপাশি হাতছাড়া হয়ে যাওয়া চাকরির বাজার ফের ফিরিয়ে আনবে আমেরিকায়। অন্য ভাবে বললে, বিশ্বায়নের সুফলের অসম বন্টনের জেরে যাদের লাভের হিসেব বেশি, তারা ভোট দিয়েছে থেকে যাওয়ার, আর যারা হেরোর দল, তাদের ভোট গেছে বেরিয়ে যাওয়ায়।

বিজাতবিদ্বেষ যে ব্রেক্সিটের পিছনে কাজ করেছে এবং এখন ট্রাম্পের উত্থানের ক্ষেত্রেও করছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এগুলো একাই মূল কারণ হতে পারে না, কারণ এর পাশাপাশি গত দশকেই কিন্তু টানা

পাঁচ বছর ব্রিটেনে লেবার পার্টির শাসন চলেছে, আর আমেরিকায় বারাক ওবামা দুই দফায় প্রেসিডেন্ট হয়েছেন ?

মজার কথা হল, তাত্ত্বিক দিক দিয়ে যদিও অভিবাসনের কারণে মজুরির হার নেমে যাওয়া সম্ভব, একাধিক সমীক্ষা বলছে, সার্বিকভাবে চাকরির বাজার বা মজুরির উপর অভিবাসনের নেতিবাচক প্রভাবের কোনও মজবুত প্রমাণ প্রায় নেই। মূল কারণটা হল, ব্রিটেনের জন্মগত বাসিন্দা চাকরিপ্রার্থীদের তুলনায় অভিবাসীরা সাধারণত বয়সে তরুণ এবং বেশি শিক্ষিত হন বলেই দেখা গিয়েছে, এবং বৌদ্ধিক দক্ষতা আর উদ্যোগপতি-সুলভ মনোভাবের কারণে এঁরা দেশের আর্থিক বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানে যথেষ্ট সাহায্য করেন। একইভাবে, যতই বলা হোক যে অভিবাসীরা সামাজিক সুবিধা যোজনাগুলো অপব্যবহার করেন, একাধিক সমীক্ষা বলছে যে তাঁরা সামাজিক সুবিধা খাতে যতটা ভাগ বসান তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি কর হিসেবে দেশকে দেন।

কিন্ত তাহলে অভিবাসন এত উত্তপ্ত একটা বিষয় হয়ে উঠল কেন, আর কেনই বা সেটা ব্রেক্সিট বিতর্ক আর ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচার নিয়ে আলোচনার ভিত্তি হয়ে দাঁড়াচ্ছে? আসলে, বাজারের গতি নৈর্ব্যক্তিক, আর তাই অর্থনীতিতে দোলাচল ঘটলে অনিবার্যভাবেই একটা দৃশ্যমান বলির পাঁঠা খাড়া করতে হয়। ব্রেক্সিট ও ট্রাম্পের সম্পর্থকদের মধ্যে একটা অংশের ভিতরে নিঃসন্দেহে অপর-বিদ্বেষ আর বর্ণবিদ্বেষ কাজ করে। কিন্তু এগুলো একটা গভীরতর অসুখের উপসর্গ মাত্র। বিজাতবিদ্বেষের এই যে ঝড় – ট্রাম্প অথবা ইউকেআইপি নেতা নাইজেল ফ্যারাজের অভিবাসন-বিরোধী হুঙ্কার যার উদাহরণ – তার পিছনে অর্থনৈতিক কারণটা আসলে হল ক্ষোভটা দিগভ্রষ্ট হয়ে বিশ্বায়নের দৃশ্যমান বলির পাঁঠাদের দিকে নির্দেশিত হওয়া।

আপনি তো আর বলতে পারবেন না – বিশ্ব জুড়ে বাজারের সংযুক্তিকরণ আর আইটি বিপ্লবের দরুণ যোগাযোগের খরচ নাটকীয়ভাবে কমেছে, আরে তাই পুঁজির চলনশীলতা বিদ্যুৎগতি পেয়েছে । আশ্চর্য প্রদীপের কি দরকার, কম্পিউটারের একটা বোতাম টিপলে এক লহমায় কোটি কোটি টাকা এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যায় । অন্য উপাদান (শ্রম, প্রাকৃতিক সম্পদ) এই গতিশীলতা পায়নি, তাই বিশ্বের বাজারে পুঁজির আধিপত্য আরও বেড়েছে ? আর যেহেতু পুঁজি সেদিকেই ছুটবে যে দিকে মজুরি কম, সেই কারণেই আপনার চাকরিটাও গেছে আর মজুরির হারও গেছে থমকে। বলা তো যায়না, আপনার কিচ্ছু করার নেই, এ হোল কালের যাত্রার ধ্বনি এবং অর্থনৈতিক যুক্তির অমোঘ পরিণাম । বলা তো যায়না, উৎপাদনের নানা উপকরণের বিশ্বব্যাপী সুসমঞ্জস বন্টনের ফলে, আপনি উদ্বৃত্ত হয়েছেন, যদিও বিশ্ব-অর্থনীতির সার্বিক দক্ষতা অনেকটা বেড়েছে - কারণ উৎপাদনের খরচ কমায় আপনি নিজেইক্রেতা হিসেবে লাভ করছেন, আর চিন বা ভারতে যিনি আপনার চাকরিটা পেয়েছেন, তিনিও তো মানুষ, আর শুধু তা নয়, এখনও তিনি আপনার থেকে অনেক দরিদ্র । বলা তো যায়না, এতদিন আপনার কপাল ভাল ছিল, শ্রম এবং পুঁজির চলনশীলতার অভাবে আপনি বা আপনার আগের প্রজন্ম তুলনামূলকভাবে শ্রম-দুর্লভ দেশে থাকার জন্যে যা পাবার কথা তার থেকে বেশি মজুরি পেয়ে এসেছেন ।

না, আমেরিকায় আপনাকে বলতে হবে ঐ যে মেক্সিকানগুলো যারা এসে আপনার চাকরি চুরি করেছে, ওরা খুব খারাপ, ওরা সমাজবিরোধী, এই দেশের আইনকানুনের কোন পরোয়া করেনা । ওরা সীমানা দিয়ে পিল পিল করে ঢুকে

পড়ে, করদাতাদের অর্থে আয়েশের জীবন যাপন করছে, আর প্রচুর সন্তানের জন্ম দিচ্ছে । ব্রিটেনে বলতে হবে ঐ যে পোলিশ মজুরগুলো যারা স্থানীয়দের হটিয়ে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, তারা স্থানীয়দের তুলনায় অসৎ ও অদক্ষ কিন্তু স্বল্প মজুরির লোভ দেখিয়ে আমাদের থেকে সব কাজ নিয়ে নিচ্ছে। বলতে হবে ঐ ভারতীয় কল-সেন্টার কর্মীগুলো আর চিনা মজুরগুলো দূর থেকে অন্যায়ভাবে আমাদের চাকরি নিয়ে নিচ্ছে ।

একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, গত এক দশকে আমেরিকায় ৮০% এবং ব্রিটেনে ৭০% পরিবারের আয় হয় কমেছে নয়তো একই আছে । তুলনায় তার আগের দশকে খুব অল্প সংখ্যক পরিবার এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে । পূর্ববর্ণিত উপাদানগুলোর সাথে মিশেছে আর্থিক সংকট এবং পরবর্তী সময়ের মন্থর বৃদ্ধির হার । আর্থিক দুর্দশা সহনীয় হয় যদি তা থেকে বেরনোর আশা থাকে । দীর্ঘদিন এক অবস্থায় আটকে থাকলে, তখন সব কিছু ছাপিয়ে ওঠে প্রবল এক হতাশার ঢেউ ।

ভীড় বাসে ক্রমাগত লোক উঠতে থাকলে যাত্রীদের রোষ নতুন যারা উঠেছে তাদের উপর গিয়েই পড়ে, সবাই চান বাস কম জায়গায় থামুক। আর এর ওপরে বাস যদি মন্থর হতে থাকে, তখন হতাশা এবং রাগ উত্তরোত্তর বাড়ে । বাসের সংখ্যা এত কম কেন বা এতো আস্তে কেন চলছে সেটা নিয়ে তখন কেউ ভাবেন না। এক উত্তাল রাগ নিশানা খোঁজে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করে পুঞ্জীভূত হতাশা উগরে দেবার ⍰

সাদা চোখে জাতিগত পরিচয় যতটা ধরা পড়ে, দুনিয়া জুড়ে অর্থনীতির মানচিত্রের ওলোটপালট ততটা পড়ে না। তাছাড়া বাজারের অদৃশ্য হাতের

তুলনায় অভিবাসীদের মত দৃশ্যমান এবং শনাক্তযোগ্য গোষ্ঠীর দিকে আঙ্গুল তোলাটা অনেক সহজ ⍰ তাই তারা হয়ে দাঁড়ায় বিশ্বায়নের নন্দ ঘোষ। কেন পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে অর্থনৈতিক অসন্তোষ বিজাতবিদ্বেষের রূপ নিচ্ছে এই গল্পের মধ্যে তার অন্তত আংশিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে ⍰

৩

বিশ্বায়নের গুণগ্রাহীরা সত্যিই এক অস্তিত্ববাদী সংকটের মুখোমুখি । এর মধ্যে মূলধারার অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ এবং নীতি-নির্ণায়কেরা আছেন, মুক্ত বাজার ও গণতন্ত্রের যুগলবন্দীতে ইতিহাসের শেষ সোপানের দিশা দেখতে পাওয়া সরল বিশ্বাসীরা আছেন, আছেন সমাজতন্ত্রের পতন-পরবর্তী দুনিয়ার পোড় খাওয়া বাস্তববাদী বামপন্থীরাও।

বিংশ শতাব্দীর সূচনা হয়েছিল মার্ক্সের চিত্রনাট্য দিয়ে – সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শোষণমুক্ত সমাজ তৈরি করবে এই আশাবাদের আবহসঙ্গীতে সর্বহারাকে জাগতে বলা হয়েছিল, মানবজাতের মিলনের স্বপ্ন দেখা হয়েছিল । সেও ছিল এক বিশ্বায়নের স্বপ্ন, যার মূল মন্ত্র ছিল পৃথিবীর শ্রমজীবি মানুষ এক হও! শতাব্দীর শেষ হোল তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক মডেলের সার্বিক পরাজয় দিয়ে। এ পরাজয় শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানো বা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাভিত্তিক অর্থনৈতিক মডেলের অসারতা উপলব্ধি করা না, এক গভীরতর নৈতিক সংকট। তার মূলেও আছে অসাম্য - স্বাধীনতার বদলে নিপীড়ন, এবং উন্নয়নের বদলে জনগণের জন্যে দারিদ্রের সমবন্টন আর পার্টির এলিট আর আমলাদের জন্যে সামন্ততান্ত্রিক বিলাস ও যথেচ্ছাচার

। জনসংখ্যার একটা বড় অংশের প্রতিষ্ঠানবিরোধী বিক্ষোভ ছাড়া শুধু বাইরের ধাক্কায় এতো বড় একটা কাঠামো তো রাতারাতি ভেঙে পড়েনা !

বিংশ শতাব্দীর সমাপ্তি হোল অ্যাডাম স্মিথ আর মিল্টন ফ্রিডম্যানের চিত্রনাট্য দিয়ে – যাকে ওয়াশিংটন ঐকমত্য (Washington consensus) বা নব্যউদারনীতি (neo-liberalism) বলা হয় । এর এক স্তম্ভ হোল পুঁজি ও বাণিজ্যের বিশ্বায়ন । আরেক স্তম্ভ হোল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা কমিয়ে বেসরকারি উদ্যোগের সহায়কের ভূমিকা পালন করা । তার মধ্যে পড়ে সরকারি নিয়মকানুন, প্রশাসনিক ও পরিকাঠামোর সংস্কারের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগের পথ মসৃণ করা, বেসরকারিকরণ, আর সরকারি রাজস্ব এবং আর্থিক নীতির মূল লক্ষ্য ব্যয়সংকোচ এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের ওপর রাখা । ভারতে নব্বইয়ের দশকের গোড়া থেকে যে উদারীকরণ, তা এই ধারারই অঙ্গ ⍰

সমাজতন্ত্রের এবং নব্যউদারনীতির হাজার তফাৎ থাকলেও, দুই ভাবধারারই দৃষ্টিভঙ্গি মূলত আন্তর্জাতিক, এবং মডেল আলাদা হলেও, কেউই বিশ্বায়নের বিরোধী নয় । আর উল্লেখযোগ্য ভাবে, দুই মডেলের ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠানবিরোধী যে ঝড়ে ভিত নড়ে গেল, তার মধ্যে সাধারণ মানুষের মনে অসাম্য ও নিজেদের ক্ষমতাহীন মনে করা নিয়ে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ (এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার সাথে একধরণের সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের উত্থানের) বড় ভূমিকা আছে ।

আইএমএফের “নিওলিবারালিজম : ওভারসোল্ড?” নামে সাম্প্রতিক একটি রিপোর্ট বলছে, উপযুক্ত নিরাপত্তাজাল ছাড়া মুক্ত বাণিজ্য এবং ব্যায়সঙ্কোচ নীতি রূপায়ণের সঙ্গে অসাম্য বৃদ্ধির সরাসরি সম্পর্ক পাওয়া গিয়েছে। এটাও দেখা যাচ্ছে যে সেটা আর্থিক সমৃদ্ধি এবং মুক্ত বাণিজ্য, অর্থাৎ নব্যউদারনীতি ঠিক যে দুটো বিষয়কে ইন্ধন দিতে চায়, আখেরে সে দুটোরই ক্ষতি করে (ঠিক যেমন ব্রেক্সিটের ক্ষেত্রে দেখা গেল)। এ কথাগুলো তো জোসেফ স্টিগলিৎস বা পল ক্রুগম্যান বা দানি রডরিকের মত মূলধারার মধ্যে বাম-ঘেঁষা অর্থনীতিবিদরা বহুদিন ধরে বলছেন। সে যাই হোক – আইএমএফ-ও যদি মনে করে যে বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, নব্যউদারনীতির পক্ষে সময়টা সত্যিই খারাপ বলতে হবে। এটা ঠিক, যে সনাতনী বামপন্থীরা চিরকালই জানতেন নব্যউদারনীতি জিনিসটি বিশেষ সুবিধের নয়, এবং বর্তমান বাজারে তাঁরা “ধনতন্ত্র সংকটে” বলে বেশ উল্লসিত হয়ে উঠেছেন। এঁদের বলে লাভ নেই যে সংকট সেই ব্যবস্থারই হয়, যার এখনো অস্তিত্ব আছে, আর তাই সমাজতন্ত্রের কোন সংকট নেই!

বিশ্বায়নের এই যে গভীর, গভীরতর অসুখ এখন, কি তার আরোগ্যের পথ? প্রগতিশীল মূল্যবোধ এবং গণতন্ত্রের সাথে মেলানো যায় এমন কোন বিশ্বায়নের মডেল কি সম্ভব?

হাত গুটিয়ে বসে থাকলে এই বাড়তে থাকা অসাম্য একের পর এক আরও দেশকে বাধ্য করবে বহির্বিশ্বের মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিতে, ঠিক যেমনটা ব্রেক্সিট নির্বাচনের ক্ষেত্রে ঘটেছে। তাতে অসাম্য হয়তো কমবে, কিন্তু সার্বিক ভাবে সমৃদ্ধিও কমে যাবে শুধু তাইনা, বৃহত্তর অর্থে

বিশ্বায়নের রথের চাকা উল্টোদিকে ঘুরলে তাতে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ, যুদ্ধের আশংকা, এবং আন্তর্জাতিক স্তরে পরিবেশ এবং মানবাধিকার নিয়ে সহযোগিতার বাতাবরণ নষ্ট হয়ে যাবে।

এটা ঠিক যে বিশ্বায়ন বর্তমানে যে রূপ নিয়েছে, তাতে উন্নত এবং অনুন্নত দেশের শ্রমজীবি মানুষের থেকে বৃহৎ পুঁজি ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বার্থ অনেক বেশি প্রতিফলিত। বিশ্বায়নের গোঁড়া সমর্থক অর্থনীতিবিদ লরেন্স সামার্স (যিনি ক্লিন্টন জমানায় অর্থমন্ত্রকের দায়িত্বে ছিলেন) সম্প্রতি একটি লেখায় মেনে নিয়েছেন যে সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশের স্বার্থের পরিপন্থী হলে, শুধু অর্থনৈতিক দক্ষতার যুক্তিতে বিশ্বায়নের তেতো পাঁচন গেলানো যাবেনা ? অর্থাৎ শুধু দক্ষতা নয়, অসাম্যের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। যে কোন সংস্কার সাধারণ মানুষের জন্যে সহনীয়ভাবে রূপায়ণ করতে হবে, শুধু আর্থিক দক্ষতা বা জাতীয় স্বার্থের দোহাই দিলে চলবেনা। আবার একই সাথে পিচ্ছিল পুঁজি করের এবং নিয়ন্ত্রণবিধির জাল এড়িয়ে যেভাবে পালিয়ে যায় এক দেশ থেকে আরেক দেশে, তা আটকাতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার চুক্তি সেই একই উদ্যমে করতে হবে, যা এতদিন মুক্ত-বাণিজ্যের প্রসারের জন্যে করা হয়েছে।

এই মুহূর্তের আরেকটা বড় চ্যালেঞ্জ হল বিশ্বায়নের যুগে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণা নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনা যায় কি করে ? এর মূল লক্ষ্য হওয়া উচিৎ বাণিজ্য, বাজারের প্রসার, আর অভিবাসনের ফলে যে সুবিধা তৈরি হচ্ছে, আবার একই কারণে কিছু কিছু গোষ্ঠী যে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে, সে দুটোর মধ্যে কি করে ভারসাম্য রাখা যায়।

অর্থনৈতিক পরিবর্তনে যাদের ক্ষতি হচ্ছে, তাদের সুরক্ষিত রাখার জন্য যথাযথ নিরাপত্তাজাল তৈরি করার উপরে জোর দেওয়াটা এখন আশু প্রয়োজন। ব্যয়সঙ্কোচ আর মুক্ত বাণিজ্য নীতি একইসঙ্গে চালানো যায় না, ঠিক যে জিনিসটা ব্রিটিশ সরকার এখন করে চলেছে। আর আমেরিকার কথা বলতে গেলে, তারা উন্নত বিশ্বের মধ্যে জনকল্যাণ নীতির নিরিখে সবচেয়ে কম উদার দেশগুলির একটা।

বিশ্বায়ন সুযোগও তৈরি করে। কিন্তু বাণিজ্যের প্রসার যে সুযোগ তৈরি করে, তার সুবিধে নেবার ক্ষমতা সবার সমান হয়না । বাণিজ্য আর বিনিয়োগ টানার বিষয়ে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়, ঠিক ততটা গুরুত্ব দিয়েই নিশ্চিত করতে হবে দরিদ্রতর শ্রেণীর মানুষেরা যাতে বিশ্বায়নের নিয়ে আসা সুযোগগুলির সদ্ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু, ব্রিটেন এবং আমেরিকায় অর্থনৈতিক গতিশীলতা তৈরি করে পরবর্তী প্রজন্মকে যাতে সেই সুযোগগুলো ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুত করে তোলা যায় সেই লক্ষ্যে নীতি নির্ধারণ করা হচ্ছে না। বরং শিক্ষার খরচ বাড়িয়ে আর বেসরকারি শিক্ষাকে মদত দিয়ে দিয়ে উচ্চশিক্ষাকে পুরোপুরি ভাবে খেটে খাওয়া মানুষের নাগালের বাইরে বার করে দেওয়া হচ্ছে। তারই সঙ্গে আরো জাঁকিয়ে বসছে শ্রেণী অসাম্য আর এলিট সমাজের প্রতি ফুঁসতে থাকা ক্ষোভ, সে তারা নিজের দেশের নাগরিকই হোক বা তুলনায় সফল কোনও অভিবাসী গোষ্ঠী।

ব্রেক্সিট নির্বাচনের একটা বড় শিক্ষা হল, এই নতুন দুনিয়ায় শ্রেণী বিভেদটা হচ্ছে শিক্ষার ভিত্তিতে, সম্পত্তি বা সুবিধার ভিত্তিতে নয়। পাশ্চাত্যে বাড়তে থাকা অসাম্যের জন্য অনেকাংশেই দায়ী দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমের মজুরির মধ্যে

বাড়তে থাকা তফাত। এর একটাই অর্থ দাঁড়ায়। পুনর্বন্টন-সংক্রান্ত নীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ খাতে আর্থিক বরাদ্দ বাড়ানোর মত বিষয়, মানে যেগুলোকে বন্টনপূর্ব নীতি বলা হয় তাদের উপর জোর দিয়ে সুযোগের সাম্য বাড়ানো প্রয়োজন। বিশ্বায়নের ফলে তৈরি হওয়া সুযোগগুলি নিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যে স্বার্থের সংঘাত তৈরি হচ্ছে তা প্রশমিত করার এটাই উপায়।

শিক্ষা তো মানুষকে সামাজিক ক্ষেত্রে সহিষ্ণুও করে তোলে। আর, অ্যাডাম স্মিথ কিন্তু শুধু রাষ্ট্রসমূহের সম্পদের উৎস হিসেবেই বাজারের প্রশস্তি গাননি, বাণিজ্যিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ যে মানুষকে আরও সুসভ্য করে সেকথাও লিখে গেছেন। বিশ্বজনীনতা আর সামাজিক ক্ষেত্রে উদারতার একটা সংস্কৃতি গড়ে তোলা আশু প্রয়োজন, যাতে মানুষের সমাজ বিজাতবিদ্বেষ ও বর্ণবিদ্বেষের মত নিজের সবচেয়ে ভয়াবহ প্রবৃত্তিগুলোর হাত থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পারে।

ধনতন্ত্রের যে নানা দিক, অ্যাডাম স্মিথ তার মধ্যে ব্যক্তি বা সমষ্টির সচ্ছলতার চাবিকাঠি হিসেবে মুক্ত বাণিজ্যের উপর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছিলেন। কার্ল মার্ক্স জোর দিয়েছিলেন, অসাম্যের উপর। এই দুই অবস্থানকে সচরাচর পুরোপুরি বিপরীতমুখী হিসেবেই দেখা হয়। একুশ শতকের গোড়ার একটা প্রধান শিক্ষা হোল, এই দুই ভাবধারা হয়তো ততটা পরস্পরবিরোধী নয়। তবে তার জন্যে ফলাফলের ও সুযোগের অসাম্য মধ্যে পার্থক্য করতে হবে।

ফলাফলের অসাম্য হোল রোগের লক্ষণ – বাজারের ক্রীড়াঙ্গনে যার সাধ্য অল্প, তার আয়ও অল্প। কিন্তু বাজার বন্ধ করে দিলে তার সম্বল বেড়ে যাবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। তার থেকে সুযোগের অসাম্যের দিকে নজর দেওয়া দরকার, যাতে তার বা তার সন্তানের সাধ্য বাড়ে, আর তার ফলে আয়ও বাড়ে। ভাল রাস্তা হলে, পুরনো গাড়ির তুলনায় নতুন গাড়ি বেশি জোরে চলবে এই বলে রাস্তা বন্ধ করে দেবার যুক্তি মানা যায়না। তার থেকে যাঁদের পুরনো গাড়ি, তাদের নতুন গাড়ি কিনতে সাহায্য করা উচিত।

বামপন্থী অর্থনীতিবিদ জোন রবিনসন মজা করে বলেছিলেন, শোষিত হবার থেকেও খারাপ শোষিত হবার সুযোগ-ও না পাওয়ার! আসলে বাজার মানেই তো অসাম্য নয়, বাজার সুযোগও তৈরি করে। আর, যা কিছু সুযোগের প্রসার ঘটায় তাই দরিদ্রের ক্ষমতায়নে সাহায্য করে। তা না হলে, তাঁদের রাজনৈতিক দল বা আমলাতন্ত্রের কৃপাপ্রার্থীই থেকে যেতে হয়। তাতে কোন বামপন্থা সিদ্ধ হয়?

বাজারের (এবং, সেই যুক্তিতে অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের) স্বপক্ষে এই যুক্তিটি জোরদার। সনাতন বামপন্থীরা ভাবেন বাজার বন্ধ করে দিলে অসাম্য-ও চলে যাবে। কিন্তু এ আবার সেই দৃশ্যমানতার সমস্যা – শিশু-শ্রম আইন করে বন্ধ করে দিলেই কি শিশুটি স্কুলব্যাগ কাঁধে, টিফিনবাক্স আর বইখাতা নিয়ে স্কুলে যাবে? বাজার-বিরোধী অনেক চিন্তার মধ্যেই এই "ভাত দেবার কেউ নয়, বিধি-নিষিধের গোঁসাই" মানসিকতা কাজ করে। ভারতে উদারীকরণ যে ভাবে হয়েছে তা নিয়ে হাজারটা সমালোচনা করা যায়, কিন্তু তাতে যে

আগের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার জমানার তুলনায় অনেক বেশি হারে দারিদ্র হ্রাস পেয়েছে, এই তথ্যটা তো অস্বীকার করা যায়না।

আবার এও সত্যি যে, অর্থনৈতিক সুযোগ সমান ভাবে বন্টিত হয়না। এইখানে মার্ক্সের যুক্তি অকাট্য। একজন ক্ষুধার্ত রুগ্ন মানুষকে রেসের লাইনে একজন শরীরচর্চা করা এবং সুপুষ্ট প্রতিযোগীর পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলা যায়না, সমান সুযোগ দেওয়া হোল, এবার নিজেকে প্রমাণ করো। সনাতন দক্ষিণপন্থীরা মেধাতন্ত্রের কথা বলেন, কিন্তু সুযোগের অসাম্যের পৃথিবীতে মেধাতন্ত্রের কোন ভিত্তি নেই।

অ্যাডাম স্মিথের সুযোগ-বর্ধক বাণিজ্য-মুখী অবস্থানের সাথে মার্ক্সের সুযোগের অসাম্যের বাস্তবমুখী অবস্থান না মেলালে, আখেরে সাধারণ মানুষের সুযোগও কমবে আর অসাম্যও বাড়বে। আর এই বিক্ষোভের বদ্ধ জলাশয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার শরীরের ভিতরে লক্ষ নির্বোধ পতঙ্গ বাসা গড়বে, আর তার গায়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মত রাজনীতিকরা গজাবে। ট্রাম্পের প্রস্তাবগুলো হয় অবাস্তব, নয়তো মূল সমস্যাগুলো কে আরও গভীর করবে। উনি কিন্তু বিশ্বায়নের সাধারণ শ্রমিকদের ওপর যে কুফল তার মোকাবিলা করতে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের প্রসারের কথা বলছেননা। ওঁর এক কথা যে উনি সবাইকে দাবড়ানি দিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবেন - সে চিন হোক আর মেক্সিকো। সত্যি যদি বাণিজ্য এবং অভিবাসন সম্পূর্ণ বন্ধও করে দেওয়া হয়, আমেরিকার অর্থনীতি কি আগের সোনালি যুগে ফেরত যাবে, যেখানে দেশের পুঁজি বেশি মজুরিতে অদক্ষ শ্রম নিয়োগ করবে? না, তারা তখন যান্ত্রিকীকরণের আশ্রয় নেবে ⍰ রোগের রূপক ধরেই বলতে হয়, আসল শত্রু যখন রক্তধারায় নিহিত

বীজাণু তখন তুকতাক করলে বা ওঝা ডেকে ভূত তাড়াবার আয়োজন করলে তো আর আসল অসুখ সারেনা।

আসল সমস্যাটা দারিদ্র, ক্রমবর্ধমান অসাম্য, এবং অর্থনৈতিক সচলতার অভাবের। এই তিনটে উপাদান আলাদা করে দেখা উচিৎ। দারিদ্র সব সময়েই স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে এবং অবস্থাপন্নদের প্রতি বিক্ষোভ তৈরি করে ⍰ কিন্তু বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক সচলতার আশা, এই বিক্ষোভকে আংশিকভাবে প্রশমিত করে। সমস্যা হয়, অসাম্য ক্রমবর্ধমান হলে⍰ তখন "আমরা আর ওরা" এই শ্রেণী-দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে ওঠে কারণ নিজে বা পরবর্তী প্রজন্মের কারোরই অর্থনৈতিক সাফল্যের আশা মরীচিকাসম হয়ে দাঁড়ায়। এর সাথে যদি বৃদ্ধির হার হ্রাসমান হতে থাকে, তাহলে এক অন্ধকূপে আবদ্ধ হবার অনুভূতি হয়। অন্তত আগের প্রজন্মের থেকে ভাল আছি, বা আমার অর্থনৈতিক অবস্থার খুব উন্নতি হলনা কিন্তু আমার সন্তানেরা ভাল করবে, এই ভেবে সান্ত্বনা পাবার অবকাশও থাকবেনা। পাশ্চাত্যে সংখ্যাগুরু শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে যে শ্রমজীবি শ্রেণী তাদের কোন গভীর হতাশাবোধ ট্রাম্পের মত রাজনীতিকের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বুঝতে গেলে, এই তিনটে উপাদানের মিশ্রণের রসায়ন বুঝতে হবে।

এই প্রসঙ্গে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের সংস্কারের একটা নতুন প্রস্তাব অনুধাবনযোগ্য – তা হল, ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকাম বা সর্বজনীন ন্যূনতম আয়। এই ব্যবস্থায় ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরকার কোনও শর্ত ছাড়াই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পাঠিয়ে দেবে। এর একটা বড় সুবিধে হল, কে গরিব আর কে নয়, এটা নিয়ে ভাবতে হবেনা, এবং তজ্জনিত নানা দুর্নীতি ও আমলাতান্ত্রিক অপচয় এড়ানো যাবে

⍰ এর জন্যে অর্থনৈতিক যে নিরাপত্তা জাল তৈরি হবে, তা হয়তো ট্রাম্পের মত রাজনীতিকের বিদ্বেষ ও বিভেদমূলক মতাদর্শের আকর্ষণ খানিকটা কমাবে।

এরকম প্রকল্পের খরচ নেহাত নগণ্য নয় ⍰ তার জন্যে প্রয়োজন পুঁজির আয়ের ওপর কর। তাতে এক ঢিলে দারিদ্রের সাথে অসাম্যের সমস্যারও লাঘব হবে। আমেরিকায় আয়করের সর্বোচ্চ হার হল ৩৫% আর পুঁজির দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের থেকে লাভের (capital gains) ওপর সর্বোচ্চ করের হার হল ১৫%। তাই, আদতে এই কর ব্যবস্থা প্রগতিশীল নয়, তার উল্টো। পুঁজির আয়ের ওপর কর অসাম্যজনিত বিক্ষোভকে প্রশমিত করবে আর সেই রাজস্বের টাকা অংশত সর্বজনীন ন্যূনতম আয় প্রকল্পের ওপর ব্যয় করলে তা অর্থনৈতিক ভাবে দুঃস্থ মানুষকে স্বস্তি দেবে ।

কিন্তু তাদের সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের জন্যে এই নীতিগুলো যথেষ্ট নয়। অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং সচলতার জন্য দরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো এই সব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ, যাতে অদক্ষ শ্রমিকেরা নিজেরা না পারলেও তাঁদের সন্তানেরা অন্তত উন্নয়নের সোপান বেয়ে ওঠার এবং বিশ্বায়িত পৃথিবীর নানা সুযোগের সদ্ব্যবহার করার সক্ষমতা অর্জন করতে পারেন। তখন তাঁরা সেই সোপান বেয়ে ওঠার আকর্ষণে আবার সামনে তাকাবেন, আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়াবেন, বুকের মধ্যে বিশ্বলোকের সাড়া পান আর না পান, অন্তত হতাশার বদ্ধকূপে বসে একই অবস্থায় থাকা পাশের মানুষের প্রতি বিদ্বেষে অন্ধ হবেননা, কেননা তারা অন্যরকম দেখতে।